Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পদৃষ্টি

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Abu Dayen
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.3
Pages	৪৯-৬০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পদৃষ্টি

Check for updates

আবু দায়েন*

কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) ব্যক্তিগত জীবনে কয়েক বছর (১৯২৭-৩৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার্থে অক্সফোর্ড-যাত্রার পূর্ববর্তী ওই সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি রবীন্দ্ররচনার প্রথম পাঠক। কবির ইচ্ছে অনুযায়ী সৃষ্ট শিল্পকর্মের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপবিন্যাস, গ্রহণ-বর্জন, পুনর্লিখন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। এর আগে কবির সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি বিদেশেও গিয়েছেন। সে-কারণে, এ কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, অমিয় চক্রবর্তী আগাগোড়া রবীন্দ্রপ্রভাবিত। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর রচনাকর্ম পাঠে এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করা যাবে না। বরং সর্বদা রবীন্দ্রবৃত্তে বসবাস করা সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তী স্বতন্ত্র শিল্পদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের নতুন রীতি ও সুরের অন্যতম স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক। তাঁর কবিতা অনায়াসে সে সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি কখনো অনুরুদ্ধ হয়ে, কখনো বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, কবিতা তথা সাহিত্য ও শিল্পের রূপ-রীতি নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত উঁচুমানের কিছু গদ্যরচনা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা মিলে তাঁর রচিত সৃষ্টিসম্ভার ক্ষীণাবয়ব নয়। তবে বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর গদ্যগ্রন্থ মাত্র দুটো : *চলো যাই* (১৯৬২) ও *সাম্প্রতিক* (১৯৬৩)। তন্মধ্যে ভ্রমণবিষয়ক ক্ষুদ্রাবয়ব পুস্তিকা *চলো যাই* সবিশেষ গুরুত্ব সত্ত্বেও বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক নয়। সে হিসেবে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ *সাম্প্রতিক*-এ প্রতিফলিত শিল্পচৈতন্যই আমাদের অন্বিষ্ট। তবে উক্ত পুস্তকের বাইরে ১৯৯৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এ পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত কবির দুটি প্রবন্ধ ও তিনটি সাক্ষাৎকার সংকলিত হয়েছে। সে-কারণে উক্ত দুটো গ্রন্থই অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পবোধ তথা সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণে আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুটো গ্রন্থভুক্ত রচনায় কবি অমিয় চক্রবর্তী কখনো সাহিত্যসমালোচনার প্রেক্ষাপটে, কখনো শিল্পসাহিত্য-সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-সম্পর্কে, আলাপচারিতা-সাক্ষাৎকারে একরকম স্বকীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পদৃষ্টির বিকাশের পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ('খসড়া' ও 'একমুঠো'র আলোচনা-প্রসঙ্গে) মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক :

> ইংলণ্ডে যাঁরা এই নতুন সাহিত্যের কর্ণধার অমিয় আজ অনেক দিন ধরে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়ে এসেছেন। নূতন কালের কোন্ প্রেরণা কোন্ বেদনা এইসব কবিদের সৃষ্টিকে প্রাণবান করেছে কাছে থেকে তিনি তা জেনেছেন। এবং তার প্রবর্তনা তাঁর নিজের মনের মধ্যে এসে কাজ করেছে (বসুরায়, ২০০১: ৭৯)।

সুতরাং অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পদৃষ্টি বিকশিত হয়েছে স্বদেশ ও বিশ্বকে আত্তীকরণ করেই। তাঁর বহুপঠিত ও অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ব্যক্তিমনন সৃষ্টিশীল রচনার পাশাপাশি সাহিত্যের রূপতত্ত্ব ও শিল্পচৈতন্যের বিশেষ বিশেষ দিগন্ত স্পর্শ করেছে। "সেই মনকে চিনে নেওয়া যায় তার

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

গদ্যরচনাগুলিতে। অজস্র গদ্য লেখেননি তিনি, খুব নিয়মিত লেখেননি, প্রাবন্ধিক হয়ে ওঠার কোনো বাসনা তাঁর ছিল না। মনে হয় তাঁর গদ্যরচনা যেন তাঁর কবিতারই পরিবর্তিত চেহারা" (বসুরায়, ২০০১ : ৭৯)। এ চেহারাকে কেউ-কেউ বলতে চেয়েছেন 'অনুভববেদ্য উচ্চারণ', 'স্থূলভাষায়' 'কাব্যিকতা' (বসুরায়, ২০০১ : ৭৯)। সুমিতা চক্রবর্তী বলেন :

> অমিয় চক্রবর্তী প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিছু। তার মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধও ছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু এবং জীবনানন্দ — যেভাবে যথেষ্ট পরিমাণে, যথেষ্ট অভিনিবেশ ও গুরুত্ববোধের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে গেছেন — তেমন পাওয়া যায় না অমিয় চক্রবর্তীর রচনাসম্ভারে। তবুও তাঁর গদ্যরচনার পরিমাণ একেবারে অবহেলা করবার মত নয়। নিজস্ব একটি মনোভঙ্গির উৎসারণ, নিজস্ব একটি চারিত্র্যও অনুভব করা যায় সেই গদ্য লেখাগুলির মধ্যে (চক্রবর্তী, ১৯৯৭ : ১৪০)।

অমিয় চক্রবর্তীর গদ্য তাঁর বোধ-স্বভাবের নম্রতা আর মিতভাষিতার সমন্বয়ে সূক্ষ্ম কাব্যিকতা-আক্রান্ত। তাঁর শিল্পচৈতন্য কবিতার আধ্যাত্মিক সংশয়ের অন্তর্গত বেদনার রঙে-নম্রতায় ভিন্নতর সুন্দর। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিচৈতন্যের আন্তরিক সংশ্লিষ্টতার ফলে অত্যন্ত স্বচ্ছ, তির্যক ও নান্দনিক। সাহিত্যের রূপ-রীতি-আঙ্গিক ও নন্দনতত্ত্বের কালকেন্দ্রিক ও কালানুক্রমিক ধারার সঙ্গে তাঁর স্বকীয় বোধ যুক্ত করে সমসাময়িক ও উত্তরকালের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর গদ্যরচনা তথা প্রবন্ধসমূহে প্রতিফলিত এ সাহিত্যিক আদর্শ বাংলাভাষী সাহিত্যপ্রেমী ছাড়াও বৈশ্বিক মানদণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধসমূহে প্রতিফলিত শিল্পদর্শন পর্যালোচনায় তিনটি মূল প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত শিল্প ও শিল্পীর যৌথ অবধারণ; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যশিল্পের রূপ-স্বরূপ সম্পর্কে অভিভাষণ এবং তৃতীয়ত, কবিতা-সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি।

শিল্প ও শিল্পীর যৌথ অবধারণ

শিল্পদৃষ্টি-প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী শিল্পের পটভূমি ও শিল্পীর দূরদর্শিতার ওপর জোর দেন। তাঁর দৃষ্টিতে, জীবন সমতলভাবে হাঙ্গামাপূর্ণ বা নিপাট-নিস্তব্ধ শান্তির নয়। জঠরজ্বালা, রোষ-ক্ষোভ, ঈর্ষা-দ্বেষ, কাম-বিবমিষা আর সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বে জীবন নিয়ত পর্যুদস্ত। তা-ও মানুষ বাঁচে, স্বপ্ন দেখে, সভ্যতা ও শিল্প গড়ে। জীবন থাকে চলমান। জীবনের এই সচলতার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সৃজ্যমান থাকে শিল্প। মানুষ, বিশেষত সৃষ্টিশীল মানুষ, তার চৈতন্য উজাড় করে উদ্গীরণ করে 'স্বপ্নছেঁড়া পারিজাত'। সমাজ-রাজনীতির উত্তাল বিক্ষোভে যেমন, স্নিগ্ধ-প্রশান্ত সুখের দিনেও তেমনি শিল্পীর চৈতন্য নিঃশেষ হয় না। শিল্পঋদ্ধির প্রগতিতে পৃথিবী ভূষিত হয় সমৃদ্ধির বরমাল্যে। তবে ঐতিহাসিক বোধ-ব্যাপ্তিসম্পন্ন মানুষমাত্রই স্বীকার করেন যে, সংক্ষোভ আর দুর্যোগের কালই শিল্পরচনার জন্য অধিকতর উপযোগী। 'শিল্পদৃষ্টি' প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তী বলেন :

> মানুষের সমাজে যখন নানা উগ্র মতাবলম্বী দর্শনের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই শিল্পদৃষ্টির প্রশস্ত কাল। রাষ্ট্রিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের খণ্ডিত ব্যাখ্যায় যখন জীবনের সমগ্র ছবি চোখের ভিড়ে হারিয়ে যায়, সেই ছিন্নদশীর ভিড়ে এসে দাঁড়ান কবি, যিনি চক্ষুষ্মান। সম্পূর্ণতার বোধ ফিরিয়ে

> আনেন তিনি। সৌমনস্যের একটি স্বচ্ছ পটে প্রাত্যহিকের যথাযথ রূপ নিরীক্ষণ করা শিল্পীর স্বধর্ম (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৩)।

কিন্তু যেন-তেন প্রকারে তা করলেই হয় না। তার জন্য চাই বিশেষ কায়দা-কানুন, যা শিল্পের মূল কথা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে :

> মোটামুটি দৃষ্টি, — তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি — এর মধ্যে মোটামুটি রকমের কার্যকরী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত জীবেরই থাকে; তার উপরে উঠতে হলেই শিক্ষা ও অভ্যাস দিয়ে চক্ষুকর্ণের সাধারণ দেখাশোনার মধ্যে অদলবদল কিছু-না-কিছু ঘটাতেই হয়। শিক্‌রে পাখি কতবার তার শিকার হারায় তবে তার চোখ এবং ঠোঁট আর আঙুলের নখরগুলো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে মেঘের উপর লক্ষ্যভেদ করতে, — একেই বলে ধরার কায়দা, দেখার কায়দা। এই কায়দা ইন্দ্রিয়সকল লাভ করে অনেক দিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে (ঠাকুর, ১৯৬২ : ২৪)।

সময়ের অস্থির পোড়োভূমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পী তাঁর কল্পনার তুলি বুলিয়ে দেখান ঘটনার আবর্ত, বিচিত্র সংঘাত-সমন্বয় অথচ স্থায়ী ভূমিকার উপরে নীলাম্বর, দৃশ্যে-অদৃশ্যে মিলিয়ে এই পার্থিব আশ্চর্যতা। শিল্পী তাঁর ভাবনার বিশিষ্টতায়, বলার ভিন্নতায় অথবা বলা চলে উপস্থাপনার গুণে একদিকে দুঃখের নিপুণ চিত্র-দ্বারা মানুষের মনে জাগান সহানুভূতি, অপরদিকে অন্বিষ্ট পৃথিবীর রূপ এঁকে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন কল্যাণব্রত-ধ্যানে, সুন্দর আগামীর স্বপ্নে। আবার কখনো-বা নিছক রূপোপজীবিতার নান্দনিক স্পর্শে রাঙিয়ে দেন মানুষের চৈতন্য। তবে কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়ে এই শিল্পধারণা। ধ্যানের বিলীনতায় প্রত্যক্ষকে হারিয়ে যে-ধরনের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা তা কেবল নয়, কাছের অসংখ্যকে কেবল স্বার্থের ও তথ্যের বন্দিশালা বানিয়ে যে-বাস্তব তাকেও দূরে রাখেন শিল্পী। কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু,

> এই মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিশক্তি শিল্পীর সহজাত, অন্যের পক্ষে দুরূহ। তাই সংসারে যে-দৃষ্টির প্রকাশ তাকেই বেঁধেছে মানুষের অতিবুদ্ধি। শিল্পীর মুক্তি যে কত বড়ো, তার সর্বত্রচারিতা বহুদর্শিতা মানুষের পারস্পরিক সভ্যতার পক্ষে একান্ত কাম্য সেই কথা দলীয় মতদ্বন্দ্বিতার দিনে বারবার অনুভব করতে হয় (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৩)।

অমিয় চক্রবর্তী মনে করেন, শিল্পীর কর্তব্য হচ্ছে, আপাত সত্য থেকে শিল্পসত্য ছেঁকে আনা। যারা চিত্রিত হয়, শিল্পদৃষ্টিতে তাদের সমগ্র রূপ দেখানো শিল্পীর দায়িত্ব। সংসারে রূপ-ঝুলকালির সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী। ক্ষীণস্বার্থের বশবর্তী হয়ে যারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাদের উভয়পক্ষই হৃদয়ে একরকম সত্য লালন করে। সে-সত্যের জোর যার বেশি সে-ই যে জয়ী হবে তা উচ্চৈঃস্বরে বলা সম্ভব নয়। আক্রান্ত আর আক্রমণকারী দুপক্ষই নিজস্ব সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করে। মাঝখানে যন্ত্র বা পণ্যসভ্যতার প্রচার বা নিদেনপক্ষে প্রতাপের আধিপত্য ঘটনার ভিন্ন আবহ তৈরি করে হয়ত। কিন্তু শিল্পীর দায়িত্ব এর মধ্য থেকেই সত্য আর সুন্দরের আবিষ্কার, তার শিল্পধর্মের প্রতিষ্ঠা। অমিয় চক্রবর্তী বলেন, "ঘটনা যতই ভয়ানক হোক, সংসারে সর্বত্র দেখা যায় উভয় পক্ষেই মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকে, সেই সত্যকে বর্জন ক'রে শিল্পের সত্যরক্ষা হয় না" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৯)। ভক্তিক্ষুধাতুর মানুষ বাস্তবের ওপর রঙ চালিয়ে কত অনৈসর্গিক প্রতিমা বানায়! নিজের

প্রয়োজনে চলমান সত্যকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। যুদ্ধংদেহী সৈনিক বা বিবদমান রাজনীতিক নিজের পক্ষেই সমস্ত সত্যের উপস্থিতি প্রমাণ করতে চান। কিন্তু উভয়পক্ষের কল্যাণী রূপ পরিগ্রহণ করা বা ছেঁকে আনা সম্ভব হলে দেখা যায়, সত্য সব-মানুষেরই অন্তঃস্থ সৌন্দর্যের সার। পার্থক্য এই যে, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে আপাত অসত্যকেও সত্য বলে চালাতে চায়। চায় দোষমুক্ত সুসংগতি দিয়ে রুচির অনুকূল করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

> যে অন্ন তার প্রাণরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক, তাকে কেবলমাত্র আপন ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে পশুর মতো যেমন তেমন করে মানুষ খেতে পারে না। যে-ক্ষুধা প্রকৃতিদত্ত তার আশুনিবৃত্তি সংবরণ ক'রে মানুষ তার উপরে স্বরচিত শিল্পের শোভনতা বিস্তার করে (ঠাকুর, ২০০১ : ১৮)।

প্রকৃতপক্ষে, এই শোভনতা আরোপের মধ্য দিয়েই শিল্পের প্রতিষ্ঠা। এরূপ শোভনতা তথা ঔচিত্যবোধ বা মাত্রাজ্ঞান শিল্পীর থাকা চাই, যেমনটা মনে করেছিলেন ক্লাসিক যুগের রোমান কবি-তাত্ত্বিক হোরেসও (মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৬৫)।

অমিয় চক্রবর্তীর মতে, শিল্পীর মানসিক অবস্থার ওপর তাঁর সৃষ্টি-সামর্থ্য নির্ভরশীল। তেরো শ' পঞ্চাশ বাংলার ইতিহাসে দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষ্যবাহী। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সামাজিক অসংগতি ও উৎকট ব্যাধিতে বিপন্ন হয়ে ওঠে মানবতা। সংবেদনশীল মানুষ যে-যার অবস্থান থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছে তখন। যারা একান্ত দরদী, কিছু পরিমাণে যারা সেবার কর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের হাতে সময় থাকলেও মনে সর্বদা তার আনুকূল্য ছিল না বলে কবির ধারণা। তারা আন্তরিক বেদনাকে শিল্পের মূল্যে সমর্পণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন কি-না কবির প্রশ্ন। 'তেরো শ পঞ্চাশের বাংলা' প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তী বলেন :

> শিল্পের সত্যরক্ষার জন্য শুধু ভাবনায় নয়, আঙ্গিকের সাধনাতেও সত্যলাভ করতে হয়। নিদারুণ ঘটনায় উত্তেজিত মানসের অবস্থা শিল্পের আপন বিশিষ্ট সাধনার প্রতিকূল। তাই দেখা যায় যথার্থ শোকের প্রকাশ সৃজনশিল্পের অভাবে কৃত্রিম শোনায়; কাব্যের ক্রোধ, যা একান্ত ক্রোধের ভাবই পাঠকের চিত্তে পৌঁছিয়ে দেয়, তা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে যথেচ্ছায় ব্যক্ত করা অসম্ভব (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৩৭)।

এখানে বিবেচ্য হচ্ছে বাস্তবতাকে শিল্পরূপদান-প্রসঙ্গ। বের্টোল্ট ব্রেখটের (১৮৯৮-১৯৫৬) এপিক থিয়েটারের আলোচনা-প্রসঙ্গে টেরি ঈগলটন বলেন :

> বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা হওয়া উচিত বিস্তৃত, রাজনৈতিক এবং সবরকমের প্রথাবদ্ধ ধারণার উর্ধ্বে... কোন কৃত সাহিত্যকর্ম থেকে আমরা বাস্তবতাবাদের ধারণাকে গড়ব না, বরং পুরানো ও নতুন, পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত, শিল্প থেকে আহরিত বা অন্য কিছু থেকে নেওয়া সবরকম উপায়কে ব্যবহার করব যাতে বাস্তবতাকে মানুষের কাছে এমন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করতে পারি যা তারা আয়ত্ত করতে পারে (ঈগলটন, ২০০১ : ১০৩)।

সে-কারণে বাস্তব বা বাস্তব-প্রতিকল্প বিষয়ের শৈল্পিক উপস্থাপনায় শিল্পীর বিশেষ দায়িত্ব থাকে। এ দায়িত্ব দুভাবে বিচার্য। শিল্পীর নেহায়েত শৈল্পিক বা বিশুদ্ধ নন্দতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন; অথবা ভোক্তার গ্রহণ করার সামর্থ্য বিবেচনা করার ব্যাপার। তবে যে-

ভাবেই তা হোক না কেন, ঈগলটন উদ্ধৃত বক্তব্যে 'এমন আঙ্গিকে' বলে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গণমানুষের নিকটবর্তী কি-না সে-প্রসঙ্গ মাথায় রেখেও শিল্পের শাশ্বত রূপ অস্বীকার করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, 'অসহায় দ্রষ্টার আসনে বসে মুমূর্ষুদের বর্ণনা করার লজ্জা লেখক পাঠক দু'জনেরই'। মানুষের দুঃখ এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে সে-বিষয়ে বলতে হলে 'সুরের সমাহিত ভাব', 'ভাষার আব্রু' চান কবি। কারণ, 'কাতরতা প্রকাশের চেয়ে শ্রদ্ধার মৌনতাই প্রশস্ত'। কবির মতে, দয়ার ভাষণ বড়ো পাপ, আত্মপ্রসন্ন লঘুছন্দে কারুণ্যকীর্তনের চেয়ে নির্যাতিতকে অভিশাপ দিলেও সম্মান রক্ষা হয়। সক্রিয় মনোবৃত্তির আরেকটা পরিচয় ভাষার উগ্রতা — বিশেষ ঘটনাকে অত্যন্ত জাহির করে দায়িত্ব এড়ানোর এই পদ্ধতিতে আর যা-ই হোক শিল্পসাধন হয় না। শিল্পসাধনার এ-প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিভঙ্গি সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। কারণ, সাহিত্যে বা শিল্পে আনন্দ যদি মুখ্য হয়, তবে বীভৎসতাকেও সৃষ্টির সৌন্দর্যে রাঙাতে হবে। তার প্রকাশের ধরন শিল্পীর চৈতন্য পাঠকের সঙ্গে সমন্বিত করে রূপ সৃষ্টির সহায়ক হবে : "সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা ও ব্যাকুলতা শিল্পীর মনে প্রকাশের আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাঠকের মনে উদ্বুদ্ধ করে গভীর অনুভূতি, যার পরিণাম চেতনার ব্যাপ্তি" (সান্যাল, ২০০৫ : ১২৫)। সুতরাং চেতনার এই ব্যাপ্তি ছাড়া না হয় সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা, না হয় বোধের জাগরণ। সে-ক্ষেত্রে সৃষ্টির সূক্ষ্মতা শিল্পীর কাছে একান্ত কাম্য।

কোনো বিশেষ ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার উপায় তাকে 'সত্যের চলন্ত এবং স্থির ভূমিকার যোগে একাগ্র উপলব্ধি' করা, শিল্পের প্রকাশে এই পরিপ্রেক্ষিত রক্ষা করতে হয় বলে কবির অভিমত। 'যন্ত্রণার চারদিকে নীল আকাশ' আর 'বিচিত্র প্রাণের বেষ্টনীকে' স্বীকার করলে তাকে ছোট করা হয় না। মর্মান্তিক অনুভূতির ধারাকে শিল্পের সংবেদনে আনন্দময় করার সেই একটা উপায় বলে মনে করেন কবি। যা সুস্থ, মানবতায় যা স্বাভাবিক, তাকে ক্ষণে-ক্ষণে বোধনে জাগ্রত না রাখতে পারলে অনুভূতিও বিমর্ষ হয়। তাই কবি বলেন :

> সৃষ্টির জগতে এমন কোনোই অবস্থা ঘটে না যেখানে চিরন্তন সংসর্গ যুক্ত হয়ে নেই, সবের মধ্যেই আমরা আছি। যে-শিল্পী কেবলমাত্র বীভৎসকে দেখালেন তিনি নিরন্ন ছিন্নকন্থা মানবত্বকেও ক্ষুণ্ন ক'রে দিলেন — এমন শিল্প চাই যাতে পূর্ণ অস্তিত্বের অধিকারকে স্বীকার করতেই হয়। শ্রদ্ধা জাগানো দরকার। শিল্পী যেন এ-কথা না ভোলেন যে পটের আকাশে কালি ঢেলে দিলে কিছুই দেখা যায় না, সবখানি শাদা থাকলেও যেমন শূন্য। চাই আলো কালোর শিল্প (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৩৮)।

কবির মতে, 'বর্ণের বিমিশ্রতা দ্রষ্টব্যে আছে', 'দ্রষ্টার চোখে'ও আছে। যার জন্য ছবি আঁকা হচ্ছে তার দর্শকও 'রঞ্জিত রেখাঙ্কিত অনুভূতির তারতম্যে'র মধ্য দিয়ে দুঃখ ও সত্যকে দেখে। মন্বন্তরের কবিতায় সৃজনীশিল্পের এই সূক্ষ্মতা রক্ষিত হয়েছে কি-না সে আলোচনা প্রসঙ্গে কবির উদ্ধৃত দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরসূরির জন্য বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এ ক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তীর কলাকৌশলপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়। সমালোচকের মত থেকেও এ-বিষয়ের সমর্থন মেলে : "আধুনিকদের মধ্যে অমিয় সবচেয়ে কলাকৌশলপ্রিয়, তিনি কখনো কখনো ধাঁধানো এবং ধাঁধা সৃষ্টিতে উৎসাহী" (আজাদ, ১৯৯২ : ৪৬)।

সাহিত্যশিল্পের রূপ-স্বরূপ

সাহিত্যশিল্পের স্বরূপ অবধারণের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন 'কেন লিখি?' সাহিত্যশিল্পে আদি ও অমীমাংসিত প্রশ্ন। উত্তর যেমনই হোক, সৃষ্টিকাজ সম্বন্ধে একটা বিস্ময় থেকেই যায়। কেন কী হয় তার সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা চলে অবিরাম। আশ্চর্যের রহস্য-দরোজাটা বন্ধ হয় না। অমিয় চক্রবর্তীর মতে :

> লেখকের নিজের কাছেও যেমন তার রচনার ব্যাপারটা অজানিত, সমালোচকের কাছেও তাই।... এক টুকরো শক্ত কাঠ, তার মধ্যে সীসে; অথবা কালিলাগানো নিব — এর সঙ্গে আমার সুখ দুঃখ চেতনার কী যোগ? কতকগুলো কালো কালো সোজা-বাঁকা দাগের মধ্যে প্রাণের ভাষা কোথায়? কেন এই অদ্ভুত আচরণের উদ্ভব হ'ল, পৃথিবীতে এসে মানুষেরা উপুড় হয়ে বসে অক্ষর চিহ্ন করতে লাগল — লেখার এই কারুরহস্যটুকুও অজ্ঞেয়। লিখিত ভাষা, অর্থাৎ বাহিরের শব্দ এবং রেখা দিয়ে অদৃশ্য মনোভাবকে বন্দী করার এই প্রবণতাটুকু কেন-লিখি-র একটা অনুত্তর-বদ্ধ প্রশ্ন (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৩৯)।

তা সত্ত্বেও উত্তরের সন্ধানে অভিযান থামে না। কবি তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করেন জিজ্ঞাসা-সংশ্লিষ্ট আদ্যোপান্ত। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তা কোনো উত্তর নয়, বরং অনুভূতির ভিন্ন রঙে আরো কিছু প্রশ্নের গুচ্ছ। এসব প্রশ্ন থেকে এক-কথার সঠিক উত্তরটা হয়ত পাওয়া যায় না; কিন্তু লেখকমনের গোপন অলিগলির সন্ধান মেলে কিছুটা হলেও। কবির অনুভবের জগৎটা নিম্নরূপ :

> লিখতে-বসার কালে মনের স্নায়ুবিধান সম্বন্ধে কেন লিখি-র প্রশ্ন। সজ্ঞানে কি জানি কী লিখছি? কোনটা লিখব, কোনটা নয়? কেবল কি আমার খুশি? কিংবা আমার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে জড়িত আমার ইচ্ছা মিলিয়ে একটি সজ্ঞান সংকল্প আমাকে লেখায়? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলব দুটোই সত্য। কখনো কোনোটা প্রাধান্য পায়। খুশির নেশায় গান লিখি, কবিতা লিখি; ছন্দের খেপামি, মনের মধ্যে সুরের ঘূর্ণিত গুনগুন ধ্বনি, যা অর্থের চেয়ে বেশি, যা আমার অভাবিত কল্পমুহূর্তের সোনা ছোঁওয়া ভাবনা, সেই ভরদুপুর কবিত্বে-পাওয়া সেই আত্মবিস্মৃত রচনার মধ্যে কেন-লিখি প্রশ্নটা অতল জলে ডুবে যায়, যেমন আস্ত একখানা পূর্ণিমার চাঁদ ডুবে যায় স্বচ্ছ আকাশে। আবার তারই মধ্যে বাস্তব চাঁদটাকেও যে দেখি না তা নয়, হয়তো আমার লেখবার ইচ্ছাটাকে জলজ্যান্ত ভাবেই দেখতে পাই গাছের পাতার আড়ালে, রাস্তার বাড়ির ছাত পেরিয়ে — আমি কী বলতে চাই তা খুবই স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে মানসের সমুখে। এই-সব রূপক দিয়ে কথা বলা অসঙ্গত নয় যেখানে ভাব-রূপের রহস্য কিছুতেই স্পষ্ট কথায় স্পষ্ট হয় না, তির্যকভাবেই যাকে সোজা দেখানোর উপায়। কিন্তু জানি আমার বিশেষ কিছু বলবার সংকল্প এবং আমার অভাবিত শঙ্কিত বাক্যের স্বতঃপ্রকাশ এই দুয়ের যোগেই আমার কেন-লিখির প্রশ্নটাকে খতিয়ে দেখতে হয় (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৩৯-৪০)।

লেখার আগে সব লেখক যে খুব স্পষ্ট তাগিদ বা উদ্দেশ্য নিয়ে বসেন তা নয়। সে-তাগিদকে জোর করে জাগানো যায় না নিশ্চয়ই। হঠাৎ জাগে। কবির অনুভূতি এরকম :

> প্রবণতা তৈরি করতে পারি মাত্র, মনকে বাঁধতে পারি, চরিত্রশক্তিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজের ধ্রুবসুরে বেঁধে তুলি, মানুষের বড়ো অধিকারে সকলকে সমান জেনে সংহত সাম্যচিত্তে যখন কলম নিয়ে লিখতে বসি তখনো আয়োজন চলছে। এই আয়োজনকে প্রত্যহ সত্য ক'রে

> তোলবার সাধনা লেখকের। কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, বা সম্পূর্ণ অবস্থাতেও যখন হঠাৎ ঠিক কথা, স্পষ্ট যুক্তি, সুভাষিত মনোভাব এসে পৌঁছতে থাকে তখন জানি আমার চেষ্টার অতীতে একটি আত্মশক্তির ক্রিয়া চলেছে। লেখকের সেই আত্মশক্তি তার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়, যার যতটা আয়ত্তাধীন লেখক হিসাবে তার শক্তির পরিচয় তত বড়ো (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪০)।

আবার প্রাচীন পশ্চিমি ধাঁচের মিউজ বা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো বলছেন :

> অনেক সময় মনে হয় নিজের মধ্যে সমস্ত মানসিক কারখানার কোন একজন বড়ো কর্তা আছে, তাকে বাদ দিয়ে যথাবিধি লেখা, ভাবা, যুক্তিতর্ক, হৃদয়াবেগের প্রাত্যহিক নানাবিধ নিয়মিত কাজ কর্ম চলতে থাকে, কিন্তু সবটা চালনা করা, কী তৈরি হচ্ছে তার তদারক করা, এবং সমস্ত আয়োজনকে হঠাৎ অন্য পথে নিযুক্ত করার কাজ লেখকের মনের কোন এক মনোনায়কের হাতে। হঠাৎ দেখি যে-উপমা ব্যবহার করছি তার মানে গেছে বদলে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে কোমর বেঁধে লিখছি তারও গভীরে আমার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বা আমার কালের উদ্দেশ্য, দেশ বা জাতির উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গেছে (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪০)।

অবশ্য কিছু কিছু আপাত উত্তর বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে, যাতে মন তৃপ্ত না হলেও নাছোড়বান্দা প্রশ্নকারীকে বিরসবদনে হলেও বিদায় করার মওকা পাওয়া যায়, যদিও তা সংক্ষিপ্ত-সরল কিছু নয়, তাতেও জড়ানো রূপকের রহস্য :

> সামাজিক উদ্দেশ্য আমাদের লেখার পথকে বেঁধে দেয়; নিছক আনন্দ দেবার উদ্দেশ্য, আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যও পথ বাঁধে; কিন্তু একটা অধিক ব্যাপারও আছে তা স্বীকার করতেই হবে। মনোধারা বইবার কালে কোনটা রাখে কোনটা বর্জন করে, কীভাবে কোন রূপ দাঁড়িয়ে যায় শ্রেষ্ঠ সৃজনধর্মী লেখার বেলায় তা অত্যন্ত স্পষ্ট বলা যায় না; অগোচরেই তার ক্রিয়ার প্রধান পরিচয়। প্রাণের সকল পরিচয়েই এই নেপথ্যবিধান আছে, দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রাণের রহস্যকে ধরে দেওয়া চলে না। হাড় গুনে, প্রতি অঙ্গের ব্যবহার এবং সুব্যবহারের তালিকা তৈরি ক'রে প্রাণধারণের ভালো বিধি আমরা বের করব, শারীরতত্ত্ববিদের কাছে আমাদের যাওয়া দরকার, কিন্তু প্রাণের সজীবতা প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও প্রাণের অপরিমেয় রহস্য নিহিত আছে — কেন-লিখি-র পুরো জবার দিতে গেলে তাই ভুল জবাব দিতে হয়। কেননা লেখাটাই জবাব (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪১)।

অবশেষে কবির সরল স্বীকারোক্তি : 'কেন লিখেছি? — এর সম্পূর্ণ উত্তর তাই কোনো লোকই দিতে পারেন বলে জানি না'। কারণ, কড়া সমালোচক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহিত্যিক-বিচারকও এক জায়গায় এসে প্রাণের অজ্ঞেয় সহজতার কাছে মাথা নিচু করেন, বলেন — কেন আমরা লিখি তা ঠিক জানি না। এটা যদি মিস্টিক শোনায় তো উপায় কী? — এ-ই শেষ পর্যন্ত 'নিরেট সত্য' বলে কবির অনুভব :

> কাল আমাকে লেখায়, স্বভাবও আমাকে লেখায়, এই দ্বৈত সত্যকে স্বীকার করব। আমি যদি জাত-লিখিয়ে হই তাহলে আমার লেখার ক্রিয়া আমার অস্তিত্বের সঙ্গেই গূঢ়যোগে একক — আমি কেন লিখি, আর-একজন কেন ছবি আঁকে বা বীন বাজায় তার মূলে যে অস্তিত্ব এবং প্রকাশের যুগ্মতা আছে তাকে সৃষ্টিব্যাপারের মূলে নেমে অনুসরণ করতে হয় (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪১)।

জীবন দুঃখবিমুক্ত নয়। শিল্পীর কাজ দুঃখের ভেতর ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবন। আমরা জানি, প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্যে সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষেরই

নিরংকুশ অধিকার। পৃথিবীর সব দেশ ও জাতির সাহিত্যে এ কথার সত্যতা প্রতিপাদনযোগ্য। ভারতীয় ঐতিহ্যও সে সাক্ষ্যই দেয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ* সমাজের মূল স্রোতের বাইরে নিপীড়িত ব্রাত্যজনের করুণ দীর্ঘশ্বাসের সাক্ষ্যবাহী। সে হিসেবে তা নিম্নবর্গীয় জনের সমাজবাস্তবতার ব্যতিক্রমী উদাহরণ। কিন্তু ধ্রুপদী যুগের ভারতীয় সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে ধর্ম, দেব-দেবী ও ঈশ্বরানুগত্যে মানবসত্তার বিসর্জন এবং সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এসব রচনার পাঠক যেমন উঁচু শ্রেণির মানুষ, তেমনি তার অন্তর্গত জীবনও তাদেরই। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ-সমন্বিত ওসব রচনাপাঠের অধিকার থেকে নিম্নশ্রেণি বঞ্চিত। এসব রচনার আলোকে যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নন্দনতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে তা-ও ওই বিশেষ শ্রেণির আনুকূল্যবাহী। আধুনিক যুগে সে দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে সব মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে। যদিও ভারতীয় সাহিত্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিরল নয়, তথাপি এ কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যে, পশ্চিমি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের চৈতন্য মানবসত্যের অবিনাশী সুন্দরকে বুক পেতে গ্রহণ করেছে। ইউরোপীয় নবজাগরণ ও শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নতুনরূপে বিন্যস্ত হওয়ায় আমরা যেমন অভিনব সমাজসত্যের প্রতিষ্ঠা দেখেছি, তার প্রেক্ষাপটে তেমনি উদ্‌গত হতে দেখেছি নতুন শিল্পরূপ। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর চৈতন্য দ্বারা এ সত্যের স্বরূপ অনুভব করেছেন এবং সাহিত্যে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। মূলত সারা উনিশ শতক জুড়ে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির লালন ও পরিপোষণের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে মানবমুখিতা বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রতিহত উদ্যোগসহ অন্যান্য মানবতাবাদী সাহিত্যসেবী সে ধারাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছেন। তিরিশের বাংলাদেশে ব্যাপারটি কেবল ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সীমিত নয়। বরং তিরিশের রবীন্দ্রোত্তর কবিগণ সাহিত্যসত্য ও মানবসত্যের প্রেক্ষাপটে ঘরে বসে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন। উভয়ের রূপ-রস-নির্যাস গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন স্বদেশী সাহিত্যের নতুনতর সৌধ। ফলে একই সঙ্গে বিকশিত হয়েছে শিল্পবোধের এ মানবীয় রীতি, যা অভিনব না হলেও নতুন দিনের ইঙ্গিতবাহী। অমিয় চক্রবর্তীর নিম্নোক্ত বক্তব্য এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য :

> প্রাচীন কাব্যের নায়ক হ'ত রাজা, বহুহন্তারক যোদ্ধা, বা যাদের মনে করা হ'ত অনন্যসাধারণ; আজ সেই মিথ্যা সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে সাহিত্য। শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সাধারণের অনন্যতা। ট্রাম-কন্ডাক্টর, শিক্ষক, রিকশা-চালক, বিজ্ঞানকর্মী, পাটকলের মজুর বা হোটেলের দ্বার-রক্ষক কারও বাধা নেই নাটকের নায়ক হতে; যদি শিল্পী তাকে বেদনার মূল্য, মানুষের যথাযথ দাম দিয়ে দেখতে জানেন (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১০)।

আমরা জানি, আধুনিক সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও মানবতার জয়-ঘোষণার মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু যথাযথ মর্যাদায় সাহিত্যে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের এরূপ তাত্ত্বিক রূপায়ণ খুব সুলভ নয়। অন্যত্র দেখতে পাই,

> কবি বা শিল্পীর পক্ষে যে কোনো কারণেই অমানবিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জয়ের কীর্তি ঘোষণা করা আত্মাবমাননা, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অপমান। যেখানে নিকৃষ্ট পথই সামনে খোলা

> রয়েছে, অন্য পথ দেখা যায় না, সেখানে অর্জুনের মতো স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিতেই মানুষের পরিচয়। সেখানে ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাই শিল্পীজনোচিত (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৮)।

প্রসঙ্গত, সমস্ত *গীতার* মূল দর্শন শঠতার হন্যতার কুরু-পাণ্ডবের আচরণকে সমূহ প্রত্যাখ্যান করে। 'সমদর্শিতাই' ঐশীদৃষ্টির অর্থে সেখানে ব্যাখ্যাত। সে দৃষ্টি পাপকে অগ্রাহ্য করে না। কিন্তু পাপের বিরুদ্ধে আচরণেও শ্রেষ্ঠ ধর্মকেই একমাত্র রক্ষণীয় বলে জানে। কেননা, দৃষ্টিমানের পক্ষে জয়পরাজয়ের লৌকিক বিচার নেই। *বাজসনেয় সংহিতায়* যে 'সমীক্ষা'র কথা বলা হয়েছে তারই আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয় অর্জুনের চোখে : "যে নিজে বেঁচে থাকতে চায় সে কেমনে অন্যকে আঘাত বা হত্যা করে? নিজের জন্য যা ইচ্ছা কর, অন্যের জন্যেও তা-ই ইচ্ছা কোরো।" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৬)। দুঃখের বিষয়, সমাজে মানবধর্মের পতন ঘটে, এবং সেই ভ্রষ্টতারও যথাযথ রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কবির। সে-কারণে *মহাভারতে* ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অর্জুনকেই লেখক শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা যে নান্দনিক জীবনসত্যের সন্ধান পাই তা আধুনিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে মূল্যবান সারাৎসার হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ সত্য কবি অমিয় চক্রবর্তী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন, যা সাহিত্যের অন্তর্গত দর্শন তথা সাহিত্যতাত্ত্বিক বিবেচনায় তাৎপর্যপূর্ণ।

সৃষ্টির নামে জটিল বাগ্‌বিস্তার সাহিত্যে যেমন হয়, তেমনি হয় সমালোচনায়ও। এই 'অনাবশ্যক জটিল এবং অস্বচ্ছ বাক্‌বিস্তার'কে উপদ্রব হিসেবে চিহ্নিত করেন অমিয় চক্রবর্তী। এরূপ জটিল বাগ্‌বিন্যাসে মননশীল ও কালোত্তীর্ণ রচনার উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা বিষয়কে ভাষার জটিলতার আড়াল দিয়ে শিল্প বলে চালানোতে প্রবল আপত্তি আছে কবির। তিনি নিজে মননের চর্চা করেছেন, তার অন্তর্গত বিষয় আনুপূর্বিক তাঁর জানা। তাই তিনি নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করতে পারেন ওসব অর্বাচীনের ফাঁকি। সুতরাং 'বৃষ্টি' কবিতার সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ওই ধরনের অপচেষ্টাকে তিনি বলেন :

> আসলে যা মননশীল নয়, কেবলমাত্র অতিমননশীলতার ব্যক্তিগত বা যৌথ অভ্যাস — তাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া চলে না। যে-আর্শিতে মূল কাব্যের একটি সমগ্র পরিচয় পাঠকের পক্ষে কাম্য তা যদি শব্দের ওজনে এবং দুর্বোধ্য মনোবিকলনে চাপা পড়ে তাহলে সেটা সাহিত্যদর্পণের নামে অত্যাচার। কবিরা অনেক দোষ করেন সন্দেহ নেই; কিন্তু কে চায় কবিতার বদলে কণ্টকারণ্য? (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ৪৮)।

সমালোচনার উত্তরে পরিমিত ও রুচিশীল জবানিতে তিনি কেবল প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেন না, বরং সাহিত্যতত্ত্বে দান করেন মূল্যবান সংযোজনা।

ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মাইন্ড বইয়ে মার্কিন ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কি লিখেছেন, মানুষ যখন কথা বলে সেটা অন্তত তিন অর্থে সৃষ্টিশীল ঘটনা। তা ভাষার অন্তর্নিহিত অপরিমেয় প্রাচুর্য — কত-রকম কথা বলা যায় তার কোনো শেষ নেই। এই অশেষত্ব সৃষ্টিশীলতার আশ্রয়। তারপর, মানুষ যা বলে তা তার স্থানকালের পরিস্থিতির হুকুম-মাফিক হয় না। যিনি কথা

বলছেন তার স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপনের সৃষ্টিরুচি প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত, লোকে যা বলে তার থাকে একটা সংহত গ্রন্থন আর প্রাসঙ্গিকতা। অনেকের মতে, এই তৃতীয় অর্থের সৃষ্টিশীলতা অর্থাৎ গাঁথুনি আর প্রাসঙ্গিকতাই কবির পক্ষে সবচেয়ে জরুরি (দাশগুপ্ত, ১৯৯৮ : ১৪৮)। এ-প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কবির অভিমত, কেউ যখন গভীর ভাব থেকে কথা বলে তাতে গ্রন্থনা আর প্রাসঙ্গিকতা আপনিই আসে। বাইরের চেষ্টায় আসে না। যার এ বোধটা নেই তাকে তা দেওয়া শক্ত। 'সেন্স অফ প্রোপোর্শন' নেই এমন লোক নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটা সুস্থ লোকের গভীর যোগ আছে জগতের সঙ্গে। কাজেই সে নিজে থেকেই জানে কীসের থেকে কী কথা আসে বা আসতে পারে। আদৌ না বললে ভাববার ঝোঁক হয়, সবই বুঝি নিজের ইচ্ছেমতো চলছে। চমস্কির দ্বিতীয় অর্থে সৃষ্টিশীলতার 'স্বাধীনতা'র ব্যাপারটা তখন যথেচ্ছাচারে গিয়ে দাঁড়ায়। অমিয় চক্রবর্তী বলেন :

> সব তো নিজের ইচ্ছে নয়। সমাজ আছে, ঔচিত্য অনৌচিত্য আছে, শিল্পের প্রতিমার হিসেবেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে যোগ এটা তারই ব্যাপার। এই যোগটার অভাবে লোকে অদ্ভুত এবং অসঙ্গত বিকল্প আঁকড়ে ধরে। ... প্রাসঙ্গিকতা আপনিই আসে, তাকে আনতে হয় না, আনবার কোনো ধরাবাঁধা পদ্ধতিও নেই; কিন্তু আসতে দিতে জানা চাই (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৪৮-১৫০)।

জগৎ-সংসারের প্রতিপদে গাণিতিক নিয়মে সত্যের প্রয়োজন। তার জন্য একই সঙ্গে গণনা-শক্তিকেও প্রাণের কাজে লাগানো দরকার। 'সভ্যতা অর্থে হিসাবের মিল', সুতরাং আদর্শিক মূলধন এবং বাস্তব খরচে গরমিল হলে কোনো মহাজন বা মহাজাতি রক্ষা পায় না। 'সমালোচকের জল্পনা' প্রবন্ধে কবি বলেন :

> মধ্য দিয়ে বহে যায় কান্নার জল, সংসার হয় পঙ্কিল, যুগের ঐশ্বর্য যায় ভেসে। দুই বাস্তবকে মানি বলেই ধ্যানবস্তু এবং প্রাণবস্তুর মধ্যে জমিটাকে দৃঢ় করতে চাই। যুগের চেতনায় আজ অপ্রযুক্ত সত্যের দাবি অসহ হয়ে উঠল; তার এক কারণ, প্রয়োগ সত্যের সাফল্য আমরা চক্ষে দেখেছি ভোগ না করলেও মানবিক অনুভূতিও আমাদের বেশি। পৃথিবীজোড়া মারীব্যবসায়ের দিনেও এই কথা বলব। এমন অবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে এবং সর্বত্র প্রয়োগমূল্য, অর্থাৎ ব্যবহারিক উৎকর্ষের দাবি একান্ত হয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য কী (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ৪৫)।

আধুনিক যুগের প্রয়োগবাদী (pragmatic) দার্শনিক-তাত্ত্বিকেরাও মনে করেন :

> ... pragmatic principles of language usage can be shown systematically to 'read in' to utterances more than they conventionally or literally mean. Such regularly superimposed implications can then become quite hard to disentangle from sentence or literal meaning; in order to prise them apart, the theorist has to construct or observe contexts in which the usual pragmatic implications do not hold (Levinson, 1983 : 37).

অমিয় চক্রবর্তীর মতে, সাহিত্যের প্রশ্নটা সহজতর। কেননা, অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপদানের কাজই হল সাহিত্যের। অভিজ্ঞতার কোনো স্তর, কোনো বার্তাকে ঠেকিয়ে রাখা সাহিত্যের অসাধ্য। সাহিত্যের প্রকাশ প্রাণপ্রাচুর্যের এবং তা পরিণতির সন্ধান দেয়। প্রকাশের ধরনটা যেমনই হোক না কেন : কখনো স্বপ্ন দেখিয়ে, কখনো-বা স্বপ্ন-ভাঙিয়ে।

মানুষকে জাগানোর জন্য শিল্পে কত সুর — কত রাগ, কত কাছের ডাক, কত দূরের কাম্য। উপায় অন্তহীন কিন্তু লক্ষ্য এক :

> মানুষকে অস্তিত্বের সন্ধান দেওয়া। তার স্বত্বকে প্রকাশ করা। সাহিত্যের বড়ো সৃষ্টি হলো বড়োরকমের দৃষ্টি — সংসারকে দেখানো হচ্ছে। সেই দৃষ্টিতে আমাদের চোখ খুলে যায়, যাই দেখিনা কেন জীবনকে বিস্তৃত দেখি। শিল্পীর দর্শন আমাদের সঙ্গে না মিল্‌লেও তিনি নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রদর্শন করছেন — তাতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বেই। মূল্যকে প্রযুক্ত না করে সাহিত্যের উপায় নেই; সাহিত্যই প্রয়োগ। ভাষার মধ্য দিয়ে ভাবের প্রয়োগ, নানান অভিজ্ঞতার সংযুক্ত প্রয়োগ কল্পনা সৃষ্টিতে; ছন্দময় একযোগিতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন উপলব্ধ সত্যের নিশ্চয়-বোধকে প্রযুক্ত করা সম্বন্ধে উদ্বেগের যথার্থ কোনো কারণ নেই; কেননা সর্বমানবিক সত্যের প্রয়োগসাধনায় কোনো সত্যকেই বাদ দেওয়া চলে না (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ৪৫)।

শিল্পে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় না। শিল্পসাহিত্য তার মর্মে প্রবেশে কাউকে বাধাও দেয় না। অন্তত সাহিত্যের দিক থেকে কোনো বাধা তো নেই-ই। কবির সরস মতে, বাধা আছে সাহিত্যের দেউড়িতে। শিল্পীর সমাজে হয়ত দারোয়ান বসিয়ে মোটরে আসা দর্শক ব্যতীত অন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। শিল্পী নিজেও ব্যক্তিগত বাধা দিতে পারেন। কিন্তু শিল্প-প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ সর্বযুগের সমালোচকের কাছে অবারিত। প্রতিবিধান করার কাজটা শিল্পসমালোচনার বহিরঙ্গে করা যেতে পারে। সৃষ্টি-শিল্পের কাছে সমালোচক একটামাত্র দাবি আনতে পারেন বলে কবি মনে করেন, আর তা হচ্ছে, প্রকাশ করো। প্রকাশ চলতে থাক। 'কী প্রকাশ হবে তার দাবি শিল্পের কাছে নয়, শিল্পীর কাছে'। সমাজের কাছে। অর্থাৎ,

> সামাজিক মানুষরূপে শিল্পীকে বলতে হবে মানুষের অভিজ্ঞতা তোমার যথার্থ হোক। সত্য কথা বোলো। তুমি বদ্‌লাও। কবিকে বদ্‌লাতে পারলে কবিতা বদ্‌লাবে, কিন্তু আর্টের রাজ্যে বিশেষ ফরমাস খাট্‌বে না। কেননা তার কাজ সৃজিত হয়ে ওঠা। কবিতার ভালোমন্দ বিচারে প্রকাশ-শক্তির ভালো মন্দকে মূল্য দেওয়া চাই (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ৪৬)।

যত বড় তত্ত্বকথাই যে-কেউ বলুক না, সনেটের চৌদ্দ লাইন, মিল, এবং ভাষা সচল না হলে বলতে হবে ভালো সনেট হয়নি। কবিতায় যৌগিক অভাব ঘটেছে। "রাষ্ট্রতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্রের খাঁটি প্রয়োগ বিচার হবে খাঁটি প্রকাশের দ্বারা। শিল্পের প্রাণশক্তির পরিচয়েই তার যথার্থ পরিচয়, তার বক্তব্যেরও পরিচয়" (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ৪৬)। সুতরাং শৈল্পিক বিবেচনায় সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার যেমন অচল, তেমনি তাতে তার প্রকাশও অর্গলবদ্ধ।

"সাহিত্য-স্বভাবতই সাম্যধর্মী; অধিকারীভেদ ঘোচানো তার লক্ষ্য — হোক দলের, ধর্মের, বা প্রভুপন্থীর — মানুষের অধিকারকে সে ব্যক্ত না করে পারবে না। সত্য বিকৃত হয়ে সাহিত্যে প্রকাশ পেলে সেই বিকৃতিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে" (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ৪৬)। সাহিত্যের তাতে ক্ষতি হয় না। কোনো বিশেষ ধর্ম-গোত্র বা শ্রেণির প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করা, যদি তা যথার্থ সাহিত্য পর্যায়ী হয়, সাহিত্যের রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং শিল্পীর ভাবনা সাম্যধর্মী না হলে তার কর্ম সাহিত্য হয়ে উঠবে কি-না সন্দেহ।

আধুনিক সাহিত্য-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আপত্তির বড়ো আশ্রয় ছিল তার ভাষার জটিলতা (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৫০)। কিন্তু ভাষা একটি চলমান যোগাযোগ-প্রক্রিয়া।

সময়ের সঙ্গে স্বরূপ পরিবর্তনেই তার অস্তিমানতার সাক্ষ্য মেলে। সাহিত্যে যেহেতু এই ভাষাটাই শিল্পরূপ নির্মাণের আশ্রয় বা মাধ্যম, তাই সর্বদা তার সরল অনুসরণ শিল্পকে ভবিষ্যতাভিসারী না-ও করতে পারে। সুতরাং সাহিত্যের স্বার্থেই যুগের মনোবৃত্তি অনুযায়ী তার ভাষা-পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কবি বলেন, "যুগের মনোবৃত্তির সঙ্গে ভাষা কিছু কিছু বদলে যায়। যদিও মূল ভাব, অন্তর্দৃষ্টি, ছন্দের সুষমা প্রতিযুগেই রক্ষা করা চাই" (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৫০)।

'Tardition and Individual Talent' প্রবন্ধে এলিয়টের বহুলকথিত উক্তি :

> No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparision, among the dead. I mean this as a principle of aesthetic, not merely historical criticism (Eliot, 1996 : 810).

অর্থাৎ কোনো কবি-শিল্পী বা তার শিল্প এককভাবে গড়ে ওঠে না। তার ভাল-মন্দ বা তাৎপর্য সবকিছু অতীতের শিল্পী ও তার শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট। এ কথাটাই সর্বত্র জনপ্রিয়ভাবে প্রচলিত যে, সাহিত্যে ঐতিহ্যবিমুক্ত হয়ে কেউ কিছু করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, একজন মানুষ যে-কোনোভাবেই হোক বেড়ে ওঠেন তার ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে। দেশ-সমাজ আর মানবিকতার মহাকালব্যাপী রূপ-রুচি-শিক্ষা-সংস্কৃতির যাবতীয় বিষয়ে মানুষের সংযোগ স্থাপিত হয় শৈশব থেকে। এর ওপর ভর করেই তিনি ভবিষ্যতের মহাসড়কে যুক্ত হন। সৃষ্টি-সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিরূপ তাকে নিজ-ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি দান করে। এ ভিত্তি যে-কোনোভাবেই তার ঐতিহ্য। সুতরাং ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সংযোগ অঙ্গাঙ্গী। তিরিশের কাব্যমানস নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক এলিয়টের মতোই অমিয় চক্রবর্তী বলেন :

> ঐতিহ্যচেতনা চিন্তার গভীরে, রক্তের ধারায় নিহিত। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের দিক আছে। যে কোনো আধিক্যের প্রতি একটা নিষেধ। ঐতিহ্যের বাহক সকলেই। কবি এবং যে কবি নয় সে-ও। কেউ জ্ঞাতসারে, সচেতনভাবে; কেউ খুব সচেতন নয়। ঐতিহ্যের বাইরে কেউ থাকতে পারে না (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৫১)।

কবির মতে, অত্যন্ত স্পষ্ট মনে যখন বিশ্বব্যাপারকে সমগ্র সত্যে দেখার প্রয়াস জাগে তখন উপস্থিত দারুণতাকে মানুষ অগ্রাহ্য বা ভয় করে না। সত্তার জোরেই তাকে পরাজিত করে। কাব্যের শক্তি সেখানেই। জীবনে ও সমাজে যখন দুর্যোগ চরম আকার ধারণ করে, তখন আর-সবার মতোই শিল্পীর কিছু করণীয় থাকে। সাহিত্যিক তার কর্তব্য পালন করেন তার শিল্পীজনোচিত বোধের দ্বারা। সমগ্রের বোধে খণ্ডকে, সৃষ্টির পটে প্রলয়কে সে নির্ধারিত করে। সাহিত্য সে-পৌরুষের পূজারী যা কল্যাণের সহায়, আশ্রিতের রক্ষক, প্রাতিবেশিক ধর্মে যা নরোত্তম। "দুর্জনেরে রক্ষা করো, দুর্বলেরে হানো" — শুভবোধসম্পন্ন কেউ এমন কথা বলেন না। অথচ দেখা যায় শত-শত অসহায়কে বিনাশ করে পাপের প্রতিঘাত জানানোকে নানাবিধ জনমত কখনো-কখনো সমর্থন করতে চায়। এ ক্ষেত্রে সামাজিক-রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অন্যান্য শক্তির মতো একই মাপে কর্তব্য পালন করে না সাহিত্য।

প্রশ্ন জাগে, সাহিত্যের কাজ কী? *দুর্যোগের সাহিত্য* প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তী বলেন, "সাহিত্যের কাজ আজও যা কালও তাই ছিল। অর্থাৎ সত্য বলা, সবখানি সত্য বলা। নিজের জীবনের অন্তর্যোগে নিঃসৃত যে-প্রকাশ সেই আন্তরিক সর্বান্তিক সত্য ফুটিয়ে তুলতেই লেখকের সাহিত্যিকতা" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ২২)। তাই সংসারের বিরূপতাকে স্বীকার করেও যখন কবি বলেন আকাশ নীল, ঘাস সবুজ, মানুষ সত্য, তখন তিনি বিলাস করেন না। বরং "সমগ্রের স্বাদ তিনি অমৃতপাত্রে বহন করে আনেন। তখন নামা যায় মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে, পশুত্বে ধর্মান্তরিত হওয়ার চেয়ে প্রাণ দিতে পণ করি, মৃত্যুর চেয়েও যা বিনাশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় মনুষ্যত্ব" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ২২)। কবির অভিমত, সেই কথাই বলে সাহিত্য। ভোরের অরুণশ্রী আনন্দদায়ী, আকর্ষণীয়। বিশ্বসময়ের মধ্যে নরঘ্নি সময়ের স্থান স্বল্পায়ু। মানুষের মন্বন্তর তীব্র হয়েও তার হাওয়া ফিরে শান্ত হয়। সেটাই স্বাভাবিক। তাই "প্রত্যক্ষ উন্মাদনার চিত্রও সাহিত্যিক ঘটনায় রূপ নেবেই, কিন্তু উন্মাদনাকে দেখাতে হলে মানসলোকের বৃহত্তর পরিচয় দিতে হয়" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ২২)। সেই পরিচয় সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিশেষ শিল্পকৌশলে, নতুন যুগে যার আহ্বান শুনতে চান কবি। সে-পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সাহিত্যকে ভুলে গেলে চলে না।

উপন্যাসের নানা বৈষয়িক উপাদান গ্রাম থেকে আসতে পারলেও এ-কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ঔপন্যাসিক দেখা দেন শহরসৃষ্টির সঙ্গে। গ্রাম্যজীবনেও নানা জীবিকার সমবায় আছে। পূর্বকালের ছোটো-ছোটো শহরেও তাই ছিল। কিন্তু নভেল দেখা দেয়নি। নভেল বা উপন্যাসের এ উদ্ভব-প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী বলেন, আমরা যাকে আধুনিক শিল্পদৃষ্টি বলতে চাই তাতে মানুষকে বাহিরের দিক থেকে নানাধর্মী বলে জানা-ই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অসীম বিচিত্র সম্ভাব্যতার সত্যকে স্বীকার করতে হয়। গ্রামে যে-ভাবে তাঁতি, নাপিত, জমিদার ইত্যাদি আখ্যায় বন্দি করে মানুষকে এক-একটি চিরস্থায়ী বৃত্তির ভিন্নতায় বদ্ধ করা হয় তাতে জাতিভেদ রক্ষা হতে পারে; কিন্তু শিল্পের জাত যায় তাতে। কারণ নতুন যুগের শিল্পে জাতটা মুখ্য নয়। বরং জাত-পাতের আড়ালে যে বেদনা, যে আনন্দ বা নিদেনপক্ষে যে সত্য রয়েছে তা মুখ্য। শহরে অমানবিক জাতিভেদ অনেকটা নষ্ট হয় বলেই শিল্পের উৎকর্ষ দেখা দিতে পারে। 'সমবায়ী যুগের শিল্প' প্রবন্ধে কবির অভিমত, যেখানে বহু জীবিকার মধ্যে রাস্তা খোলা, একই মানুষ নানা কর্মের এবং সূক্ষ্মতর জীবনীর জাল গেঁথে তোলে, সেখানে পরিবর্তনশীল মানব-সম্বন্ধের বিবিধ যোগে উপন্যাসের শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ "উপন্যাস হ'ল সমাজবিন্যাসের প্রতিচ্ছবি, সামাজিকতার আদর্শ যেখানে অধিক পরিস্ফুট সেখানে ঔপন্যাসিকের শিল্পজাত দৃষ্টিও সার্থক রূপ লাভ করে" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪৩)। ইংল্যান্ডে উচ্চ-নীচের প্রভেদ একসময় জাতিভেদের মতোই কঠিন ছিল। কিন্তু লন্ডনে এই ভেদের দেয়াল যতই ভাঙতে লাগল নভেলের আশ্চর্য উদ্ভব হলো সেখানে। মোটামুটি বলা যেতে পারে: "নভেলের মূল প্রবণতা বহুজনের জীবনীতে গাঁথা সমাজের দিকে। তাই নভেলের জগতে যে-কোনো ব্যক্তি নায়ক হতে পারে, রাজা অথবা সংহারকর্তা বা ধর্মপ্রতাপী বিশেষ বীরের স্থান সেখানে উচ্চাসনে বাঁধা নেই" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪৩)।

শহরের সভ্যতা আজ যতই ভেদশীল হোক তার গতি গণতন্ত্র-অভিমুখী। প্রাণের বিচিত্র আবর্তে পড়ে শহরে আজ কেউ ধনী, কেউ দেউলে। ভাগ্যবিপর্যয়ের পালা চলে, ঘটনার দিক থেকেও ওঠা-পড়ার বিরাম নেই। এমনতর আবহে প্রবর্তিত :

> শিল্পীর মন স্বভাবতই মানুষকে যথার্থ দেখতে চায়, কোনো সংজ্ঞায় বন্দী ক'রে এবং বিশেষ কোনো সংস্কারের মধ্যবর্তিতায় মানবসংসারকে জানা তার ধর্মবিরুদ্ধ। নানা অবস্থায় ফেলে নিজেকেই সে দেখে এবং অন্যকেও চেনে, তার আত্মদৃষ্টি বাহিরের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে গিয়ে যথার্থ ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টি তৈরি করে (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ৪৩-৪৪)।

কাব্য-কবিতা সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি

নানা অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার শক্তিই ধারণাশক্তি। অমিয় চক্রবর্তীর মতে, ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন সূক্ষ্ম শরীর তৈরি করার জন্য প্রয়োজন মনের সম্বৃত-বেগ, যা আপন কালে ও ছন্দে প্রকাশ পায়। তাকে তাড়া দেওয়া যায় না, অথচ তার মধ্যে বিভিন্ন-সমন্বিত সৃষ্টির অনিবার্যতা থাকে। সেই প্রাণমনস্বিনী ধারাকে নতুন শিল্পে ক্বচিৎ দেখতে পান বলে আফসোস করেন কবি। 'রিপোর্টার-বৃত্তি'র প্রাবল্য আধুনিক ধারণাশক্তিকে বিড়ম্বিত করে। কারণ অমিয়র মতে, তার মধ্যে 'অভিষিক্ত চৈতন্যের স্থিরবিদ্যুৎ' নেই, যাতে 'তল পর্যন্ত দৃষ্টি' পৌঁছায়। অথচ কেবল 'ঘটনার চকমকি ঘষা'কে অনেকে 'নতুন শিল্প-সচেতনা'র সাক্ষ্য বলে মানেন। আবার কারও কারও কাছে বিসদৃশ গভীরতম যে সংগতিকাব্য, যাতে বিশ্বসত্তার সাধর্ম্য প্রকাশিত, তার সঙ্গে প্রহসনের কোনো ভেদ নেই। 'কাব্যে ধারণাশক্তি' প্রবন্ধে কবি বলেন :

> স্টক-এক্সচেঞ্জের টুক্‌রো তথ্য, দলের ঝাণ্ডা, আনুষ্ঠানিক ধর্মের পাণ্ডা, বিবৃত বুলি এবং নোংরা চায়ের পেয়ালা জোড়াতালি দিয়ে সচেষ্ট কাব্যরচনা হ'ল কাব্যের ছেঁড়া কাঁথা। কাব্য গাঁথা হয় যে-সৃষ্টির জাল বুনে তাতেও দ্রব্যের মণিহারি দোকান বসতে পারে, কিন্তু সেখানকার পসরা জুটেছে অন্যভাবে (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৪)।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে কবি একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন :

> পড়ন্ত রোদের একটি গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেল অনেক-কিছু; পানের দোকানে সবুজ পান, সোনালী ডিবে, ঝিলমিলে ঝোলানো আয়না, দোকানের লাল টালির উপরে চুপ করে বসেছে কাক। বুড়ি ভিখারি ভাঙা টিনের পাশে হাত বাড়িয়ে উদাসীন, তার অসুন্দর মুখের শীর্ণতা আলোয় চিত্রিত হয়ে দেখা দিল। তিনটে মার্কিন সৈন্যের মাথায় এসে রোদ্দুরের ঘেরটা মিলিয়ে গেছে, অথচ তারাও রইল আমার কাব্যের অন্তর্দৃশ্যে। কী বলতে চায় জানি না, কিন্তু এই একটি সমগ্র রচনা, বিশেষ অর্থে, কম্পোজিশন। ছবির ঘেরে অহৈতুক একতা (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৪)।

তাই অমিয় বলেন :

> বোধনের আলোকে শুধুমাত্র দেখাতে পারলে দর্শকের মনে হবে, দেখছি। দৃশ্য সত্য, দিবাসত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্যে মিলিয়ে অন্তর্গূঢ় আধুনিক মন খামকা কী দেখাতে চায়। তার ধারণাশক্তি একটি পড়ন্ত রৌদ্ররশ্মির অদ্ভুত পাত্রের মতো, তাতে কত-কিছুর অনিবার্য প্রবেশ, আধেয় যা-খুশির অধিকার। আমরা মেটাফিজিক্স্-এ পাওয়া সজাগ সচল ধ্যানী, যোগবিশুদ্ধ

> চোখে অলিগলিতে চেয়ে দেখি। রাস্তায় ঘাটে কবিতা ছড়ানো; সিঁড়ির ধাপে, ঐ পাশের দরজায় পিতলের কড়াটা পর্যন্ত ছবির অঙ্গ। বৃষ্টিতে লাল বারান্দা ভিজছে। এর রহস্য বিষম ছন্দে ধরা দিতে চাইল। বোঝানোর দরকার নেই। কেননা কাব্যের বাহিরে তা অসম্ভব (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৪)।

কারো কারো ধারণা হতে পারে যে, কবিতায় ভাবই বড়ো। টেকনিকের মারপ্যাঁচে ভাবকে লুকানো মানে হচ্ছে কবিতার গলা টিপে ধরা ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যা কবিতা তাতে রূপ আছে — ভাব নেই, এমনটা হতেই পারে না। অমিয় চক্রবর্তীর মতে, ভাব ছাড়া কবিতা যেমন রঙিন কাগজের মিছে চকমকি, তেমনি রূপ ছাড়াও তা কর্কশ বচন। ভাব ও রূপের যুগলবন্দিই কবিতা। 'কাব্যের টেকনিক' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> কাব্য যেখানে প্রাণবন্ত, অর্থাৎ কাব্যপদবাচ্য, সেখানে রূপ আছে ভাব নেই এমন হতেই পারে না। লিরিকের আশ্চর্য ভাবকে তার প্রকাশ থেকে আলাদা ক'রে দেখবার কি উপায় আছে? ভাব নেই কিন্তু কবিতার রূপ আশ্চর্য এমন হলে রূপের আশ্চর্যতাই থাকে না। বিশেষণটা ওখানে অপ্রযুক্ত (চক্রবর্তী, ১৯৬৩: ১৮)।

কবি মনে করেন, ভাবের দোহাই দিয়ে প্রকাশের অভাবকে ক্ষমা করাও সমান নিরর্থক। এমন কবিতা অসম্ভব, যার কাব্যভাব মহান ঐশ্বর্যময় অথচ আঙ্গিক পূর্ণাঙ্গ নয়। সে স্থলে ভাব কথাটার অর্থ নেই। কাব্যের ক্ষেত্রে ভাবও শিল্পিত হয়ে দেখা দেয়, নয়তো ভাব প্রকাশ হয়নি বলতে হবে বলে কবির অভিমত। যা প্রকাশিত হয়েছে তাই নিয়ে অবশ্য বিচার হতে পারে। কবির মতে, 'ভাষা ও ছন্দের শরীরে সমগ্র কাব্যের প্রকাশ'। যোগ্য বা পলিটিশিয়ান বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য লিখেছেন — কাব্য হয়নি কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ — এ দাবি তাঁর কাছে মূল্যহীন :

> সাহিত্য-সমালোচনায় প্রকাশই সৎ, অর্থাৎ যা সত্যই প্রকাশিত — ধার্মিক যদি অতিরঞ্জিত ভাষায় আত্মবিস্তার ক'রে থাকেন তাহলে সাহিত্যধর্ম রক্ষিত হয়নি; ধর্মের অন্য প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর। আধ্যাত্মিক সনেট পদার্থটা যদি ভালো সনেট না হয়ে থাকে তো সেটা আত্মিক নয় — কেননা জীবন্ত সনেটের আত্মা এবং অবয়ব অবিচ্ছেদ্য — এবং সেই কারণে তার আধ্যাত্মিক মূল্যও শূন্য (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৮)।

সংগীতের ভাব আর সংগীতের ধ্বনি দুয়ের 'যৌগিক শ্রুতি'কেই সংগীত বলেন কবি; বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান না। সাংগীতিক ভাব প্রায় নেই অথচ শব্দের ইন্দ্রজাল অতি আশ্চর্য এমন উক্তির উত্তরে কবি সেরকম বাজনাকে 'শব্দের মাকড়সার জাল' বলে চিহ্নিত করেন। এরূপ কিছুকে 'অত্যন্ত অশ্রাব্য' ও 'অপ্রশংসনীয়' হিসেবে গণ্য করেন অমিয় চক্রবর্তী। তাঁর মতে, যেখানে ধ্বনির ঐশ্বর্য, সেখানে ভাবেরও আশ্চর্যতা। কেবল শব্দের বিন্যাস বিস্ময়কর নয়, ক্লান্তি কর; কুশলের অভাবে কৌশল সেখানে নিরাশ্চর্য। অমিয় চক্রবর্তী বলেন :

> যদি আঙুলের কৃতিত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে তাহলে মেজরাফের বাহার এবং শেষ পর্যন্ত সেতারীর শৌখিন চেহারা অথবা গায়ের আধুনিক গেরুয়াকে সংগীতের বিচারে মূল্য দিতে হয়। সুরের জগতে দাম নেই। কবিতার আলোচনায় লেখকের ছান্দসিক কসরতকে বাহবা দিয়ে ভাবের গুণপনায় শূন্য মার্কা দেওয়ার মনস্তত্ত্ব একই। ছন্দ আশ্চর্য হবার উপায় নেই যদি তার মধ্য দিয়ে কাব্যের আশ্চর্য ভাব ছন্দিত না হয়ে থাকে; ভাবের তরঙ্গেই ছন্দ (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৮-১৯)।

রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতা ছন্দে-ভাবে অভিন্ন পরমসৃষ্টি বলেই আমাদের মনে অবচ্ছিন্ন আনন্দ এনে দেয়। সে-স্থলে ছন্দ ও বিষয়বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করে কাব্যের যৌগিক রহস্যে নিবিষ্ট হতে চান কবি। কারণ, ভাব ও ছন্দের নবীন যুগ্মতায় সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ — এ কথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। নতুন সামাজিক তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের প্রভাব এই সৃজনধারাকে বেগবান ও প্রসারিত করেছে। টেকনিকের পরিবর্তন যুগ-মনের পালাবদলের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে বলে কবি ঘোষণা করেন। তাঁর মনোভাব অতি স্পষ্ট : "সামান্য একটা কথা — রিক্‌শাওয়ালা — কবিতায় ব্যবহার করতে হলে প্রাচীন ছন্দের ঘনঘোর কাঠামোতে কুলোয় না। অথচ রিক্‌শাওয়ালা যখন বিশ্বজগতের আপন অস্তিত্বের অধিকারে বর্তমান তখন কাব্যজগতে তার স্থান আছেই" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৯)।

অর্থাৎ শব্দ কবিতায় চলবে না — এরকম ধারণা খারিজ করে দিয়ে কাব্যের ধারণশক্তিকে প্রশস্ত করে দেন অমিয় চক্রবর্তী। আধুনিক কাব্যে ছন্দের টেকনিক ও ভাবের অনুভূতি যেসব অনিবার্য পরিবর্তনের মধ্যে প্রকাশিত তার কোনো সুলভ ব্যাখ্যা আর চলবে না। বিদেশি অনুকরণ বা কেবল আঙ্গিকের অতিচেতনাকে দায়ী করে কাব্যের মূল সৃজনপ্রক্রিয়াকে বিস্মৃত হলে সাহিত্যের প্রকাশে শাশ্বত এবং অভিনব রূপপর্যায়ের রহস্যকে আমরা বিস্মৃত হব বলে কবির ধারণা। সে-কারণে তাঁর কবিতা বা শিল্পবোধে আঙ্গিক আলাদা কিছু নয়, বরং ভাব ও আঙ্গিক যুগপৎ সৃষ্টি করার দিকে তাঁর ঝোঁক। জীবনানন্দ দাশ বলেন :

> অমিয় চক্রবর্তী রয়েছেন, যিনি আঙ্গিকের একটা বিচিত্র আবহ — ... ভারি ভিতর দিয়ে জীবনের অনুধ্যান ফুটিয়ে চলেছেন। কবিতা তাঁর সরল বক্রচালের জিনিস, অস্বাভাবিকতার যতটা ভ্রান্তি উজিয়ে তোলে মনের ভিতর তার চেয়ে তা সহজ ও স্বাভাবিক। আমার মনে হয় আঙ্গিকের ইশারা তিনি পেয়েছেন হপকিন্‌স-এর কাছে (দাশ, ২০০০ : ১৫৬)।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের এক ঘোষণায় এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২) বলেছিলেন 'Image is poetry', অর্থাৎ চিত্রকল্পই কবিতা। আধুনিক সাহিত্যে এ-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে থাকার সুযোগ কম। বিভিন্ন যুগ, কৌশল ও আন্দোলনের পথ বেয়ে আধুনিককালে সাহিত্য ব্যক্তির চৈতন্য ও মননশীলতাকে আশ্রয় করেছে। বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখার অন্তর্নিহিত মৌল ধারণা এক পর্যায়ে মানুষের স্বভাব বোঝার উপায় হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার ফলে কবিতার মূল এ অনুষঙ্গ সম্পর্কে কবি ও তাত্ত্বিককে ভাবতে হয়েছে বেশ। কবিতা রচনার প্রচলিত সরল পথে তাই আর উৎকর্ষসাধন সম্ভব ছিল না। কারণ, পরিবর্তনই কাব্যের প্রগতির স্মারক বলে সমকালে বিবেচিত হয়েছে। এ-পর্যায়ে ব্যক্তির বহিরাঙ্গিক আচরণ বোঝার জন্য তার অন্তর্গত চৈতন্যে আলো ফেলার পথ বেছে নিতে হয়েছে। তাই কবির ভাবপ্রকাশের জন্যও কল্পনার বিজ্ঞানসম্মত অবলম্বন হয়েছে স্বীকৃত। ফলে কবি তার ভাবপ্রকাশের কৌশল আবিষ্কারকল্পে পাঠকের কল্পনা জাগ্রত করেছেন নানাবিধ অনুষঙ্গের সাহায্যে। ধ্বনির সহযোগে চিত্র, অর্থাৎ ধ্বনি ও চিত্রের যুগলবন্দিতা কবিতার উৎকর্ষের পথ নির্মাণ করেছে নিঃসন্দেহে। চিত্রশিল্পের যুগান্তকারী সব আন্দোলনের প্রভাব এবং একই সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অগ্রগতি কবিকে তার চৈতন্যের প্রকাশে চিত্রধর্মিতার শরণ দিয়েছে। পাঠকের মনে শব্দ-ধ্বনির সহযোগে সৃষ্টি

হয়েছে ছবি। সে-প্রেক্ষাপটে আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। অমিয় চক্রবর্তীও মনে করেন, "চিত্রকল্প ছাড়া কবিতাকে ধারণ করা যায় না" (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৫১)। এ-প্রসঙ্গে অবচেতনার ব্যাপারটিও এসে যায়। চিত্রকল্প কবির চেতন-অবচেতনের প্রকাশকে করেছে সম্ভবপর। অমিয় চক্রবর্তীও এ-উভয় চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যুগপৎ, "চেতন-অবচেতন ... কিছুটা আপনা থেকে হয়। সবটাই অবচেতন সৃষ্টি হয় না। কবিতায় দুটোই আছে" (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৫১)। আধুনিক বাংলা কবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাবের অঙ্গীকরণ যদি স্বীকার করা হয়, তবে একই সঙ্গে চিত্রকল্প বা ইমেজকে গ্রহণ ব্যাপারটাও স্বীকার করে নিতে হবে। পাশ্চাত্যে 'metaphor' ও 'simile' দুই প্রাচীন অলংকার। রোমান্টিক যুগের আগে পাশ্চাত্য সাহিত্যেও চিত্র বিশেষ মর্যাদা পায়নি। কবি-সমালোচক C Day Lewis জানান : "The idea that imagery is at the core of the poem, that a poem itself be an image composed of multiple images, did not begin to have any official currency till the Romantic movement" (Lewis, 1947 : 19)। তিনি আরো জানান, ইমেজ হচ্ছে শব্দ দিয়ে তৈরি এবং তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে কতকগুলো চিত্রের সহযোগে। সমষ্টিগতভাবে এই ইমেজগুলোই ইমেজারি। আধুনিক সূক্ষ্ম রুচি ও মননের বিস্তারের যুগে কবিতায় এই চিত্রধর্মিতা থেকে, অন্তত চিত্রশিল্পের প্রভাবের দিনে, দূরে থাকার সুযোগ কম। সে-কারণে অমিয় চক্রবর্তীর উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পাশ্চাত্য অনুকরণ নয়, বরং কবিতায় বিশ্বঐতিহ্য ও রুচির সূক্ষ্মতা স্বীকরণের নামান্তর।

অমিয় চক্রবর্তী কবিতা লেখাকে এক জটিল সূক্ষ্ম ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। কারণ, তার মধ্যে জড়িত থাকে বহু স্তরের মনন, অনুভূতির সুরগ্রাম, বহুজাগ্রত প্রয়োগের চেষ্টা একত্র হয়ে! একটি কবিতা লিখিত হয়ে যাওয়ার পর তার প্রক্রিয়ার কথা ভাবলে কখনো কখনো তার কিছু কিছু মনে আসতে পারে, যদিও তার সবটা পুরোপুরিভাবে স্মরণ করা শক্ত। হঠাৎ দেখা যায়, তা ভাবলে নতুন কিছু লিখতে দ্বিধা হয়। সৌভাগ্যক্রমে সমস্তকে বিবৃত করে এক-একটি লেখার মুহূর্ত ফিরে আসে, শুরু হয় 'ডুব-সাঁতার' দেওয়া। সজ্ঞানে মনকে কিছু শেখানো যায় কখনো কখনো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কতটুকু সৃষ্টিমগ্নতার কালে কাজে লাগে বোঝা মুশকিল। 'ছন্দ ও কবিতা' প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তী বলেন, "আঙুলের অভ্যাস ক্রমাগত শুধরিয়ে বীণা-বাজিয়ে খোঁজেন শুদ্ধতর অঙ্গুলিচালনা, যেটা ব্যক্তিগত হয়েও তারও বেশি। এই সাধনা প্রত্যেক কবিকে শিল্পীকে ক্রমাগত নতুন ক'রে মেনে নিতে হবে" (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৬২)। কবিত্বের এই সাধনাই কবিকে শিল্পসিদ্ধির চূড়াস্পর্শী করে তোলে। জীবনানন্দ দাশ কবিতা লেখা-প্রসঙ্গে কবির বিশেষ এক চেতনাস্তরের কথা বলেন, যা শিল্পরূপ পেতে প্রয়োজন সময় ও সাধনা :

> যে-লেখক এই চেতনাস্তরকে ভেদ করে আরো স্পষ্ট চৈতন্যে স্থিত হয়ে ঠিক শব্দ, ভাব, ভাষা যথাসম্ভব শীগগির লাভ করতে পারেন, তাঁর শক্তি খুব অসাধারণ, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে সে রকম লেখক খুব কম। কবিতার মোটামুটি একটা নমুনা গ্রথিত ক'রে তুলতে খাঁটি কবির অনেক সময়ই বেশি দেরি হয় না; কিন্তু তবুও কবিতাটিকে পরবর্তী প্রকৃত সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে হলে সময়েরও দরকার (দাশ, ২০০০ : ১৬৩)।

কবিতার বিষয় বড়ো বিচিত্র। জাগতিক মানুষের ভাবনার এমন কোনো দিগন্ত নেই যা কবিতার স্পর্শগ্রাহ্য নয়। স্থূল সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম হৃদয়ভেদী, সহৃদয়সংবেদী যাবতীয় বিষয় কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয় বিধায় প্রসঙ্গভেদে কবির চৈতন্য ও তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় তাতে। বিষয়মাহাত্ম্যে রূপও হয়ে ওঠে বলবান :

> বিষয়বস্তু যত সূক্ষ্ম, বিহ্বল, দূরবর্তী, সেই অনুপাতে ছন্দের বাক্যের দুঃসাহসও অনেক সময় বেড়ে যায়; সংগতিও রক্ষা করা সহজ হয়। ঠিক কবিতা-রচনার কালে নানা সূক্ষ্ম পরীক্ষা অজ্ঞাতে চলতে থাকে, পুরোপুরি মনের কোঠায় পৌঁছালে বুদ্ধির দৌরাত্ম্য প্রবল হয়ে ওঠে (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৬৪)।

অবশ্য নানা পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিতর্কের জোরে একমাত্র পথ নেওয়া কঠিন। এমনকি তাতে শিল্পের কৌশলও দ্বিধান্বিত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য :

> পরে এবং আগে বহু কসরত করা চাই — তার-বাঁধা, মীড়-টানা, ঝালার কাজ, সুরের মিশেল। কিন্তু পুরোপুরি আলাপের সময় ডুব-সাঁতারের বেলা, তখন আঙুলে কুহক লাগে, 'magic hand of chance'-গোছের ব্যাপার। অন্তত এইভাবে কোনো-কোনো শিল্পী অহেতুক একান্ত কারিগরির সন্ধান পান। বেদনার পরমতা, যা তাপকে আগুন ক'রে তোলে তার কথা সব সৃষ্টির মূলে (চক্রবর্তী, ১৯৬৩ : ১৬৪)।

অবশ্য বলাই বাহুল্য, কবি যদি ডেস্কের ধারে তার সন্ধান হারান তবে সবই লোকসান ।

সাহিত্যরচনার বিচিত্রমুখী ধারায় সবাই সফল হয় না। সময়ের স্বাদ নিয়েই লেখেন লেখক। কিন্তু কেউ-কেউ সময়ের মাত্রা অতিক্রম করে অনন্ত সময়প্রবাহে নিজেকে সমর্পণ করতে সক্ষম হন। স্থানিক ভাব-অভিব্যক্তির প্রকাশ করেও কেউ-কেউ হয়ে ওঠেন মহাজাগতিক। সে-কারণে সাহিত্যিক সার্থকতার একটা ব্যাপার থেকেই যায়। কিন্তু এরূপ সার্থকতার আশ্রয় কী — এ-প্রশ্নে তাত্ত্বিক-ভাবুকদের ভাবনার অন্ত নেই। কোনো কবি হয়ত আঙ্গিক-গৌরবে বড়, কেউ বা বিষয়মাহাত্ম্যে কিংবা অন্য কিছু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির কবিত্ব একটা সাধারণ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কবিতা সার্থক হয়ে থাকলে কীসে তার সার্থকতা এ নিয়ে কথা বলা শক্ত বলে মনে করেন কবি। আলাদা করার, বিশেষণের, কোনো দরকার নেই এমন কথা অবশ্য তিনি বলেন না; বিশেষণের গুরুত্ব আছে বইকি। কবি মনে করেন, যদি কেউ জানতে চান ছন্দের কথা বা কবিতার শরীরতত্ত্বের অন্য কোনো দিক, তাহলে তাকে অভিনিবেশসহ বিষয়টি বুঝে দেখতে হবে। এ ধরনের নিবিষ্ট অধ্যয়নে নিশ্চয়ই কবির বাইরের কৃতিত্বটা স্পষ্টগোচর হয়ে ওঠে। কিন্তু এভাবে কবির সত্যিকারের সফলতার নিরিখ মেলে না। কবি বলেন :

> যে-কবি সত্যিই সফল তাঁর সেই ভিতরের সার্থকতা থেকেই উৎসারিত হয় বহিরঙ্গ সাফল্য, ছন্দের ঔচিত্য, কথার সুবিন্যাস। অন্তরের এই সার্থকতার স্বরূপ কী জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব — ব্যক্তি হিসেবে, দ্রষ্টা হিসেবে কবির যে ইন্টেগ্রিটি, তাঁর স্বভাবের সেই পূর্ণাঙ্গতাই তাঁর আর সবকিছুর আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠাভূমি (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৪৭)।

মাসিকে-ত্রৈমাসিকে শব্দের এত স্তূপ, রূপহীন যেমন-তেমন বিবরণ। কোথাও কোথাও সাহিত্যরূপ দেখা দেয় ঠিকই, কিন্তু সচরাচর খটকা লাগে কবির। সূক্ষ্ম সচেতনতার কোথায়

যেন অভাব বোধ হয় তাঁর, 'হচ্ছে না'। হয়তো কবি নিজেও বোঝেন 'হচ্ছে না', কিন্তু সংবরণ বা সাধনা না করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে হয়ে ওঠার কাজটা আরো সুদূরপরাহত হয়। ফলে "প্রত্যেক বড় শিল্পীর লেখার যেটা প্রাণ সেই স্থানকালপাত্র সম্বন্ধ থেকে একেবারে ছিটকে সরে যান তিনি। পড়ে থাকে পদ্যে গদ্যে সেই 'অতিবাদিত্ব'' (চক্রবর্তী, ১৯৯৮ : ১৪৭)। সাহিত্যিক সফলতার পশ্চাতে এ-ব্যাপারটিও মনে রাখতে চান কবি।

শিল্পসৃষ্টি বরাবরই সাধনাসাপেক্ষ। একজন শিল্পী তাঁর স্বভাব ও প্রতিভাগুণে অন্যের চেয়ে পৃথক হতে পারেন। এ পৃথকত্ব তাঁর মধ্যে যে বিশেষত্বের সঞ্চার করে, তার দ্বারা তিনি জগৎ ও মানুষের জন্য রেখে যান নির্মল আনন্দের প্রতিভাস। এ আনন্দ কখনো আবার হতে পারে ভোক্তার জীবনসত্যে জারিত নিছক প্রয়োজনীয় দর্পিত অনুষঙ্গ। তবে যে-ভাবেই হোক, শিল্প শেষ পর্যন্ত জীবনের পূর্ণতার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। জড়িয়ে যায় জীবনসত্যে, মগ্নতায়, সংশয়ে, আস্থায়, সুন্দরে, কুৎসিতে, অটল দার্ঢ্যে বা স্তব্ধ নম্রতায়। সব কিছু মিলিয়ে শিল্প শেষ পর্যন্ত হয় জীবনের পরিপূরক, স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এ সৃষ্টি ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বসাপেক্ষ। জীবনের অটল দার্ঢ্যে অথবা ব্যথিত সংশয়ের তলে তলে বিনম্র শুদ্ধতায় এক অন্যতর বোধ, বোধি ও আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ-পিয়াসী শিল্পী জীবনের প্রতিরূপ গড়েন, কখনো বা জীবন গড়ে বিশ্বস্রষ্টার প্রতিকল্পে সমাসীন হন। এ-প্রসঙ্গে আসে শিল্পদর্শন ও নন্দনতত্ত্বের দ্বিমাত্রিক বিবেচনার কথা : প্রাচীনকালের দার্শনিক মেজাজসম্পন্ন সৃষ্টি-বিরল, শিল্পের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-বিরহিত তাত্ত্বিকের ধ্রুপদী নন্দনভাবনা, আর তৎপরবর্তী রোমান্টিকদের সৃষ্টিশীল শিল্পঅন্বেষা। অমিয় চক্রবর্তী শিল্প ও নন্দনবোধের এসব বিবেচনায় রোমান্টিক। তাঁর স্বল্পপ্রজ প্রাবন্ধিক তথা গাদ্যিক সত্তা যে নন্দনভাষ্য রচনায় সমর্থ তা তাঁর কবিচৈতন্যের অন্তর্গত নিগূঢ় বোধেরই প্রকাশক। সমকাল ও উত্তরপ্রজন্মের জন্য তাঁর এই তীক্ষ্ণ বোধ-বিবেচনাসম্পন্ন প্রবন্ধগুলো শিল্পচৈতন্যের বিনম্র সৃষ্টিসুষমায় বিশিষ্ট। তাঁর প্রবন্ধ ঋদ্ধিমান পাঠককে যেমন ভাবায়, তেমনি সন্ধান দেয় শিল্পবোধের নতুন রূপ ও সুরের। এসব প্রবন্ধে প্রতিফলিত সাহিত্যতত্ত্ব একদিকে যেমন তাঁর রচনা, মূলত তাঁর কবিতার রস গ্রহণে সহায়ক হয়; অন্যদিকে সাহিত্যের শাশ্বত-সারস্বত রূপ সম্পর্কে দাঁড় করায় তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পদর্শন। অমিয় চক্রবর্তীর এ দ্যুতিমান শিল্পদর্শন সত্যিকার অর্থেই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ উত্তরদিনের দিকনির্দেশক।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন। ১৯৯২। *আধার ও আধেয়*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ঈগলটন, টেরি। ২০০১ (২য় সং)। *মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা* (নিরঞ্জন গোস্বামী ভাষান্তরিত)। দীপায়ন, কলকাতা।

চক্রবর্তী, অমিয়। ১৯৬৩। *সাম্প্রতিক*। নাভানা, কলকাতা।

চক্রবর্তী, সুমিতা। ১৯৯৭ (২য় সং)। *কবি অমিয় চক্রবর্তী*। জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড্, কলিকাতা।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ১৯৮৩ (৩য় সং)। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। রূপা এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ২০০১। "নবযুগের সাহিত্য", 'কবিতীর্থ' : অমিয় চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষ সংখ্যা (সুখেন সাঁতরা ও অন্যান্য সম্পা.), ২০ (৫৩), কলকাতা।

দাশ, জীবনানন্দ। ২০০০। *প্রবন্ধসমগ্র*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। গতিধারা, ঢাকা।

দাশগুপ্ত, প্রবাল। ১৯৯৮। 'প্রবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.)। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ।

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.)। ১৯৯৮। *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ।

বসুরায়, ইরাবান। ২০০১। "অমিয় চক্রবর্তীর 'সাম্প্রতিক'". 'কবিতীর্থ': অমিয় চক্রবর্তী জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত।

মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। ১৯৯৪। "হোরেস ও লঙিনুস", *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পা.)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সান্যাল, ভবানীগোপাল। ২০০৫। *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের পথে*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

Eliot, T. S. 1996. "Tradition and Individual Talent" in *20th Century Poetics & Poetry*. Gary Geddes (edt). Oxford University Press, Oxford.

Levinson, Stephen C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge University Press, Cambridge.

Lewis, C. Day 1947. *The Poetic Image*. Oxford University Press, Oxford.